দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাক্ষরতা ঃ পরিসংখ্যান ও বাস্তবতা

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

বিবিধ

দশ বছর আগে যুক্তরাজ্যে অবস্থানের এক পর্যায়ে আমন্ত্রিত হয়ে আমি লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে অবস্থিত মালব্যারি গার্লস হাইস্কুলে গিয়েছিলাম। তখন ওই হাইস্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার। আর এর শতকরা নব্বই ভাগই বাঙালি। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন নামকরা শিক্ষক সেখানে কাজ করেন। এর মধ্যে বিবিসিতে কর্মরত গোলাম মুরশিদ ছিলেন অন্যতম। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিজ গ্লোরিয় আমাকে বেশ কয়েকটি ক্লাসরুমে নিয়ে যান এবং বাংলাদেশে সাক্ষরতা বিস্তারের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতার কথা শিক্ষক ও ছাত্রীদের জানিয়ে দেন। এক পর্যায়ে হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর (এ লেভেলের) জনাদশেক ছাত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রবাসী কিশোরী প্রজন্মের কাছে সাক্ষরতা বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে ধরা যাবে বলে আমি খুব আনন্দিত হলাম। শুরু হলো আলোচনা পর্ব। কুশলাদি বিনিময়ের সময় জেনেছিলাম যে, এরা প্রায় সবাই যুক্তরাজ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। তবে এক থেকে তিনবার বাংলাদেশে এসেছে। ঢাকা এয়ারপোর্টে নামার পরই হয়রানির বিবরণ দিয়ে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে আর জীবনে দেশে যাবে না। আবার টেলিভিশন চ্যানেলে দুর্যোগপীড়িত মানুষের ছবি আর পরিবেশের বিপর্যয় দেখেও কেউ কেউ দেশমুখো না হওয়ার কথা ক্ষোভের সঙ্গে বলছিল। এবার আমার পালা বলবার। আমি তখন সিলেটের একটি এনজিতেও কাজ করছিলাম এবং আমার কাজের অভিজ্ঞতা ছিল বারো বছর। আমি কাজ করছিলাম কেবল মাত্র বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে। কাজেই নিজের কাজের অনেক বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিলনা।

বারো বছর যাবৎ বয়স্ক শিক্ষার কাজ করছেন? প্রায় ব্যঙ্গোক্তির মতো প্রশ্ন করলো একটি মেয়ে। তার নাম নাসিমা। এরকম প্রশ্নে একটু আহত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি বিশ্বাস করছ না? এর উত্তরে নাসিমা যা বললো, এরঅর্থ এই যে, তার পৈতৃক নিবাস সুনামগঞ্জের জয়কলস এলাকায়। গত পাঁচ বছরে তার দুই চাচি, চাচাত ভাই ও বোন, চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী এরা বিলেতে এসেছেন; কিন্তু তাদের কেউই নাম সই পর্যন্ত করতে পারেন না। সেখানে কি না আমি দাবি করছি, সিলেটে বারো বছর যাবৎ বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে কাজে নিয়োজিত আছি। কিছুটা অবিশ্বাস থাকারই তো কথা! সিলেট বিভাগের জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতার কথা আমি তার কাছে তুলে ধরছিলাম; কিন্তু সে আমার কোনো যুক্তিই গ্রহণ করছিল না। সে বলছিল, আপনারা বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কর্মসূচি দেখিয়ে বিদেশ থেকে টাকা পান বেশ ভাল; কিন্তু এন্তার কাজ করছেন এরকম গল্প আমাদের শোনাবেন না। বিদেশের মাটিতে কিশোরী বোনদের নিকট উন্নয়নের আরো অনেক বার্তা তুলে ধরার যে আনন্দ মনের মধ্যে ছিল, তা নিমিষে মিলিয়ে যায়। আমার জবাবই বা কি আছে? সেই বৈঠকের মাত্র দু বছর আগে ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উপলক্ষে আমরা জয়কলস ইউনিয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান চালিয়েছিলাম। আমার তখনকার সংস্থা এফআইভিডিবি-এর মাধ্যমে গণসাক্ষরতার জন্য যা যা করা যায় তার কোনটিই আমরা বাদ রাখিনি। চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে মিটিং করেছি। পোস্টার ও লিফলেট ছাপিয়েছি। পাড়ায় পাড়ায় সমাবেশ করেছি। এক বছরব্যাপী দশজন কর্মকর্তা এবং এলাকায় ৬০ জন কর্মী নিয়ে সেখানে বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স চালানো হয়। সমগ্র ইউনিয়নে প্রায় ১শটি শিক্ষা কেন্দ্রে ছয়মাসের কোর্স সমাপন করা হয়। এতে প্রায় দুই হাজার বয়স্ক লোককে সাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল। ইউনিয়নে ১৫ বছরের ওপরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ হাজার। এর মধ্যে শতকরা ১৮ জন ইতোপূর্বে সাক্ষর ছিল। এক বছরের নিবিড় কর্মসূচিতে তা উনত্রিশে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছিল। কাজেই নাসিমার চাচা, চাচি, চাচাতো ভাই ও বোনরা যে নিরক্ষর হিসেবেই বিলেত পর্যন্ত যাবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দেশের বিভিন্ন জেলাকে যখন নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তখনই আমার দশ বছর আগেকার নাসিমার কথা মনে পড়ছে। বারো বছর একনাগারে সিলেটে কাজ করে কোনও এলাকাকে নিরক্ষরমুক্ত করার কোন দাবি কিন্তু আমি নাসিমাদের কাছে করিনি। তারপরেও নাসিমার দেখা বাস্তবতার মধ্যে আমার কাজের প্রতিফলন ছিল না বলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছে; কিন্তু এখন কোনরকম কার্যকর প্রস্তুতি ছাড়াই একটি জেলার সার্বিক সাক্ষরতা

আন্দোলন (এটিএলএম) চালিয়ে সেই জেলার শতকরা আশি ভাগ মানুষকে সাক্ষর করার দাবি তোলা হচ্ছে। এটি আসলে কি? সাক্ষরতা কি কোন ভোজ যে, সামনে রাখা পাত্রে কেউ দিয়ে গেল, আর সবাই তা খেয়ে তৃপ্ত হয়ে ঢেঁকুর তুলবে? দুই যুগ যাবৎ সাক্ষরতায় নিয়োজিত থাকা একজন কুশলী হিসেবে আমি বলতে পারি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমুদয় কাজের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর এটি কিনা আমাদের দেশে নির্বাহী আদেশের বলে অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিজ বাড়ি টুঙ্গিপাড়া এলাকার ৩০ জন নারী-পুরুষের সঙ্গে সম্প্রতি কথা হলো। এদের মধ্যে ২০ জনই টিএলএম কোর্সে অংশ নিয়েছেন; কিন্তু নিজেদের ঐকান্তিকতার ফলে ঠিকানা পর্যন্ত লিখতে পারেন মাত্র চারজন। বাকিরা নিজের নামও লিখতে পারেন না। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর এলাকা বলে টিএলএম-এর সকল শক্তি সেখানে নিয়োগ করতে কোনো কার্পন্য করা হয়নি; কিন্তু ফলাফল হয়েছে তা-ই। সারাদেশে টিএলএম করে জেলায় জেলায় সাক্ষরতার পরিসংখ্যানে যে স্ফীতি দেখানো হচ্ছে তা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকেই বিপর্যস্ত করবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম খুবই কম।

বয়স্ক নারী- পুরুষকে সাক্ষরতার জন্য সংগঠিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে একটি আয়াসসাধ্য কাজ। বাধ্যতামূলক আইন করে বয়স্কদের সাক্ষর করা যায় না। তাদের জন্য সাক্ষরতা হবে সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ। এমন সাক্ষরতা কর্মসূচিতেই বয়স্করা নিজ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন যেখানে যোগ দেয়ার পরবর্তী ফলাফল তারা উপলব্ধি করেন। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সাক্ষর হবেন না ঠিকই, কিন্তু যারাই সাক্ষর হবেন, উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ একটি গুণগত পরিবর্তন সাধন করবে। উদাহরণস্বরূপ এনজিওদের গত তিন দশকের বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এনজিওরা প্রায় ২৫ লাখ নারী-পুরুষকে সাক্ষর করেছে। এতে দেশের সাক্ষরতার হারে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি; কিন্তু এরা দারিদ্র্য বিমোচনের সকল কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। এরা অন্যদের নিয়ে আরও কর্মসংস্থানের বিস্তার ঘটিয়েছেন। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সবাইকে সোচ্চার করেছেন। পরিবেশ, লিঙ্গ সমতা, মানবাধিকার এসব বিষয় যুক্ত করে উন্নয়নকে বহুমাত্রিক করেছেন।

টিএলএমসহ সরকারি সকল সাক্ষরতা কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। আর দুই বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করার প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুরু হবে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির জন্য প্রায় চারশত কোটি টাকা ঋণ আনা হচ্ছে। এই ঋণের টাকায় যদি দেশের সকল সীমিত লেখাপড়া নারী- পুরুষের জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যেত তাহলে মন্দ হতো না। কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে তাদেরই জন্য, যারা নির্বাহী ঘোষণা দ্বারা সাক্ষর হয়েছেন। কিন্তু তাদের শতকরা আশিজনই লিখতে জানেন না, পড়তে জানেন না। তাহলে ওই ঋণের টাকার কি হবে? দেশের মানুষকে কি অকারণেই শত শত কোটি টাকা ঋণের জালে আবদ্ধ হতে হবে?

এ দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার ইতিহাস প্রায় ৮০ বছরের; কিন্তু বয়স্ক সাক্ষরতার মাধ্যমে দেখিয়ে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে দেখানোর কাজটি শুরু হয় ১৯৮০ সালে। ওই সময় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের দুজন করে নিরক্ষরকে সাক্ষর করার দায়িত্ব দেয়া হয়। আর ইউনিয়ন পরিষদকে দায়িত্ব দেয়া হয় ব্যাপক সংখ্যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের। এ জন্য ওই বছর ছাপানো হয়েছিল এক কোটি বই। তারপর দেখা গেল বেশিরভাগ ছাত্র নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নব্যসাক্ষরের অভিনয় করিয়ে নম্বর পাচ্ছেন আর ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিমাসে থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে নিরক্ষরকে সাক্ষর করার ভুয়া প্রতিবেদন ঢাকায় পাঠাচ্ছে। ওই সময়ে গণশিক্ষার বইয়ের বহুল ব্যবহার ছিল ঠোঙ্গা বানানোর কাজে। ১৯৮১ সালে দেশে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রতিবেদনে দেখা গেল দেশে সাক্ষরতার হার ১৯৭৪ সালে যা ছিল ১৯৮১ সালে তা কমে গিয়েছে। দেশের উন্নয়ন সংস্থাগুলো নতুন কর্ম এলাকার জন্য বেইজ লাইন সার্ভে করে থাকে। সরকার অনেক জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা দিচ্ছেন; কিন্তু সেখানে বেইজ লাইন জরিপের সময় শতকরা ৪০ ভাগ সাক্ষরও পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে সাক্ষরতা বা অব্যাহত শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় বন্ধ করার কি কোন উপায়ই নেই?

[লেখক ঃ উপ-পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র]